বাংলার শিল্পকলার পটভূমি

অশোক কুমার রায়

ইতিহাসের পটভূমিকায় শিল্পের গুত্বের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ইতিহাস যেহেতু একটি গোটা কৃষ্টির ম ালমশলা সংগ্রহ করে, তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় তাই আমাদের কৃষ্টির যথাযথ মূল্যায়ন ও সুষ্ঠ, সার্থক ইতিহাস রচনা করতে হলে এ দেশেরশিল্পকলার রূপ - প্রকৃতি ও মূল সুরটির খোঁজ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

রীতি-পদ্ধতি ও শৈল্পিক দিক দিয়ে আমাদের বিষয়বস্তুকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল সাধারণ মানুষের জন্যে -- নাম দেওয়া যেতে পারে গ্রামীণ; অপরটিকে বলা যায় শহুরে এবং রাজকীয়। প্রথমটি এ দেশের মাটিতে যুগ যুগ ধরে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একান্ত ভারতীয় ভাবেই গড়ে উঠেছে, অন্যটি রাজানুগত্য বা বিত্তশালীদের পৃষ্ঠ - পে াষকতায় লালিত হয়েছে। তবে এইদ্বিতীয় ধারায় মুল শিল্প ঋণ যেখানকারই হোক না কেন পটভূমিতে ভারতীয় শিল্পের প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের ইতিহাসবিদগণ যেহেতু রাজা-রাজড়াদের ঘটনা প্রবাহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বেশী তাই দরবার পোষ্য শিল্পের মুল সুর ও রূপরেখা জানা আমাদের অনেকটা সহজ। কিন্তু গ্রামীণ শিল্পের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট থাকলেও এর উপর আলোকপ াত হয়েছে সবচেয়ে কম। এই স্বল্পালোচিত বিষয়টিকে নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্রামীণ শিল্পকে আমরা লোক - শিল্প বা ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপেও আখ্যায়িত করে থাকি। এর প্রতি সুধীজনের সঙ্গে শহুরে ম ানুষের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয় যামিনী রায়ের (১৯০৮-১৯৭২) চিত্রের উপাদান থেকে আর অজিত মুখোপাধ্যায়ের Folk Art Of Bengal (1947) গ্রন্থটি থেকে। তারও কিছু পরে এই গ্রামীণ শিল্পকলার চর্চায় উচচ পর্যায়ের স্রষ্ট রামকিঙ্কর বেইজ (১৯৬০-১৯৮০) নিয়ে এলেন চিত্র ওভাস্কর্য্যকে লোক - শিল্পের ঐতিহাসিক ধারায়। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তঁ ার বইয়ের এক জায়গায় লোকশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এখানে এই দুই রীতিকে গ্রামীণ শিল্প বলছি।

গ্রামীণ শিল্প ও দরবারী শিল্পের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য অবশ্য আছে। গ্রামীণ শিল্প সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত কাজ, ত াতে অন্তরের টান আছে প্রাণের স্পর্শ আছে -- এর সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক। দরবারী শিল্পীদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে হত -- হয় ধর্মীয় চাহিদা, না হয়ত দরবারী চাহিদা, পৃষ্ঠপোষকের স্তুতিবাদ করতে যেমন তাদের মন জোগাতে হতো, তেমনি ধর্মীয় চাহিদা মেটাতেও তখন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হতো। সুতরাং শিল্পীর স্বাধীনতা ছিল ব্যাহত।

পাল ও সেন রাজত্বের আমলে যে ভাস্কর্য্য রীতির উন্নতি হয় তার সাথে অবিভক্ত বঙ্গের ধ্রুপদ রীতির যথেষ্ট যোগাযোগ দেখা যায় -- আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে শৈল্পিক গুণে পোষাকের ব্যবহারে এবং একটি অমানবিক রূপায়ণে।

দরবার পোষ্য স্থাপত্যে মোটামুটি ভাবে রীতির - প্রকৃতির মিল আছে, যদিও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি।

এমনকি কদাচিৎ প্রাপ্ত দরবারী চিত্রেও ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গকে স্মরণে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। রাজা রামপালের আমলে লেখা 'প্রজ্ঞা - পারমিতা' পুঁথির চিত্র - গুলিকে বাংলার চিত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ গ্রহণ করে থ াকেন। অর্থাৎ এ থেকেই হিন্দু দরবারী ঢঙ্ কে বোঝা যাবে। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত কতকগুলির পুঁথির প্রচ্ছদ - চিত্রেও পশ্চিম ভারতীয় চিত্রের উপাদান দেখা যায়। যদিও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেকে একে লোকজ রীতির আওতাভুক্ত করে থাকেন। আমার মনে হয় সারা বাংলার চিত্রশিল্পে এগুলি এক অমূল্য স ম্পদ। এগুলি যেহেতু দরবারী ও লোকজ রীতির মিশ্রণ, এ থেকেই বাংলার চিত্র শিল্পের আসল রূপরেখার খোঁজ নেওয়া সম্ভব। এদের রঙ্, রেখা ও আকার যদিও আকর্ষনীয়, রঙের টোনালিটি বা পরিপ্রেক্ষিতের কোন আভাষ নেই। --- কেবল

ভিন্নধর্মী রঙের প্রয়োগে মডেলিং ফোটানোর চেষ্টা হয়েছে।

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত ইদ্ ও মোহররম মিছিল প্রভৃতি জীবন্ত চিত্রগুলি মোগল ধ্রুপদ রীতির অপভ্রংশ এবং বাংলার দরবারী চিত্রের শেষ উদাহরণ রূপে ধরা যায়। এগুলিতে সেই দামী রঙের চাকচিক্য নেই নিপুণ তুলির, বলিষ্ঠ হাতের সমৃদ্ধতাও নেই। জল রঙ, মিনিচেয়ারের আসল মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু শাহী শান শওকত ও রাজকীয় আড়ম্বরতা দেখানোর পুরোপুরি চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য সুযোগ পেলেই শিল্পী দৈনন্দিন চেনা দৃশ্যের উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন। ঐ জাতের শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকদের ঘটনা প্রবাহ দ্রুত এগোলে শিল্পকলায় পরিবর্তন আসতোও দ্রুত।

কিন্তু আমাদের গ্রামীণ শিল্পের মেজাজই আলাদা। এর সঙ্গে শহুরে পাঁচমিশালী নানা সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পের নাআছে মনের মিল, না আছে শৈলীর মিল। এমন কি শাসক অথবা শাসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও এ শিল্পে তার ছোঁয়া লাগে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজ জীবনেই আসে আমূল পরিবর্তন। তাছাড়া সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে সবচেয়ে বেশী।

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থিতি, এর পথ ঘাট, নদী - নালা এবং সাধারণ মানুষের নিরাভরণ জীবন যাত্রা, এদের গোলা ভরা ধান, পুকুরের মাছ, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নতুন নতুন ফুল ফল ও শস্য শ্যামলা বাংলার বিচিত্র রূপ স্বল্প আয়াসে জীবনধারণেৰ ব্যবস্থা থাকাতেই বোধহয় বাঙালী হয়ে ওঠে ভাবুক - কল্পনা প্রিয় - শিল্পী। ছয় মাস কাজ আর ছয় মাস বসে থেকে এরা খুঁজে পেতে চেয়েছিল কিছু সৃজন মূলক শিস্প কাজ। যার প্রত্যক্ষ ফল আমাদের সাহিত্যে, চাকার শিল্পে ও লোকসঙ্গীতের উন্নত ক্ষেত্রগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কৃষি নির্ভর এই জীবনের অবসর থেকেই নিঃসন্দেহে জন্ম নিয়েছিল বারো মাসে তের পার্বণের, প্রতি তিথি নক্ষত্রের গতিবিধি অনুসারে পুজা, পার্বণ আমোদ আাদ প্রভৃতির। তাই বোধহয় এদেশের পথে পথে বাউলের গান। পালাত্রমে করল গাঁয়ের চাষী, নায়ের মাঝি।

আর তাছাড়া? তাছাড়া এমনি সব কাজে আনন্দ আছে অথচ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি নেই, যে কাজে পয়সার চেয়ে আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি বেশী আছে। তার চেয়েও বড় কথা যে কাজ অঝোর বর্ষণেও ঘরে বসে করা যায়। তাই এদেশের ঘরে ঘরে হাতের কাজ কুটির শিল্পের এত যুগ যুগ ধরে চর্চা। প্রাচীন শিল্পের মূল সুরটি বুঝতে হলে এসব কাজ আমাদের মনে রাখতে হবে।

বর্ষায় যখন মাঠের কাজ শেষ, তখন বাড়ীর আঙিনায় বসে বৃদ্ধ বাপ হয়তো পাটি ও মাদুর বোনে, অন্য কেউ বাঁশ বেতের সামগ্রী বানায়, আর অনেকে তামাক পুড়িয়ে গল্প করে। অন্যদিকে তখন সংসারের নিত্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে ননদ, মা'য়েদের সাথে নববধূ ব্যস্ত নক্সীকাঁথা তৈরী করতে। শাশুড়ী হয়ত কাউকে নিয়ে সুখ - দুঃখের কথা পাড়ে; আর মাঝে মাঝে পান চিবোতে চিবোতে কর্মরত বধুর প্রশংসা করে। এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায় -- এক কাঁথা থেকে আরেক কাঁথায়।

এরই মধ্যে হয়তো কখন উৎসবের দিন ঘনিয়ে আসে, কিংবা বাড়ীতে আসে নতুন অতিথি। গৃহস্থ বধু বসে পিঠে বানাতে। সে পিঠে সুস্বাদু হলেই চলবে না, তাতে থাকবে চির পরিচয় -- বহু স্বাদের বা বিচিত্র কা কাজে মণ্ডিত।

নক্সী কাঁথায়, পাটির কাজে ও পিঠার নক্সায় একটা মিল আছে। সে হল রেখার বাহাদুরীতে। নক্সী কাঁথা যেহেতু সূচের কাজ, তার রেখা হল সূক্ষ্ম; ফুল, ফল, লতা, পাতা হতে শু করে কলকা - আলপনা ও বাঘ, সিংহ, হাতী, হরিণ এবং পাখির ছবিও তাতে স্থান পায়। এগুলি যেহেতু নিজেদের জন্যেও প্রধানতঃ সখের বসেই, তাই সমগ্র কাজটির মধ্যে একটা আন্তরিকতা ফুটে ওঠা দেখাযায়। ছেলেবেলা থেকে এইসব শিল্পচর্চা মাধ্যমে নক্সার অভিনবত্ব, রঙের ব্যবহার ও সমগ্র কাজটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এক সুসম দক্ষতা ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়।

এইসব শিল্পকলায় ফরমগুলি যেমন হয় সংক্ষিপ্ত, তেমনি figureগুলি ইঙ্গিতবহ। পরিচিত সব পশু - প্রাণীই তাতে স্থান পায়। ভয়াবহ, কিম্ভুতকিমাকার কিংবা অপরিচিত পৃথিবী ওতে যায়গা করতে পারে না। ঘটনা বর্ণনার চেয়ে আলাদা আলাদা motif-ই ব্যবহৃত হয়েছে বেশী। রেখাচিত্রের কারণে ছবি হয়েছে দ্বিমাত্রিক; ঘনত্ব, গভীরতা বা পরিপ্রেক্ষিতের আভাস তাতে নেই। বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি বা বহু জিনিষের আড়ম্বরও তাতে ঘটেনি।

মাদুর পাটি প্রভৃতি মূলতঃ ব্যাবসায়িক কারণে করা। সুতরাং এর দাম সম্বন্ধে কারিগরদের সচেতন থাকতে হয়। তার সঙ্গে

বুননের জটিলতা ও সময়ের প্রশ্ন আছে; তাই নক্সা প্রধানতঃ জ্যামিতিক। ফুল লতাপাতা এবং মাঝেমাঝে প্রাণীর ছবিও হয়। তবে ফর্ম সংক্ষিপ্ত, আন্তরিকতাও কম। অবশ্য বিশেষভাবে বোনা ও চিত্রায়িত হতে দেখেছি বর্হিবাণিজ্যের বা wall decoration-এর প্রয়োজনে। চিঠার কাজে জ্যামিতিক নক্সা প্রধান। ফুলও থাকে প্রচুর, ফলের মধ্যে আম, প্রাণীর মধ্যে মাছের নক্সাদেখা যায় --- কিন্তু মানুষের চিত্র পিঠার নক্সায় স্থান নেই।

চিত্রকলার উদাহরণ দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বাংলার পটচিত্র। যা' সাধারণতঃ মাটির সরা ও প্যানেলের ওপর আঁকা হয়ে থাকে। এই পটকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে -- যেমন গাজির পট, কালুর পট, বটতলার পট, কৃষ্ণনগরের পট, ঢাকারপট, ফরিদপুরের পট, বরিশালের পট ইত্যাদির নাম করা যায়। পটের ছবি বর্ণনা মূলক, তাই এতে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ণনার ভেতরে সহজেই প্রবেশ। যা বলার সোজাসুজি বলা - ধ্যান করে স্থির করবার কিছু নেই। গাজির জড়ানো পটের কতা ধরা যাক - এতে ভাগ করে বিভিন্ন দৃশ্যকে দেখানো, আবার গান গেয়ে বর্ণনাকে শোনানো হতো .....। এতে জটিলতা, ঘটনার অযথা আড়ম্বর তা দর্শক শ্রোতাদের অসুবিধাই করে। তাই এ সম্বন্ধে সব কিছুই এড়ানো চেষ্টা, শিল্পীর স্বজ্ঞান স্বভাব বলেই মনে হয়। গাজির পটের ছবিগুলি নিজ গুণেইসমৃদ্ধ; শিল্প শাস্ত্রের ব্যাকরণ খোঁজা এখানে বৃথা। বর্তমানে এই শ্রেণীর যে সব পট দেখতে পাওয়া যায় তাতে আকর্ষণীয় দৃশ্য। বর্তমানেএই শ্রেণীর যে সব পট দেখতে পাওয়া যায় তাতে আকর্ষণীয় দৃশ্য সিংহ, বাঘ, ইত্যাদি হিংস্র প্রানীর ছবি দেখিয়ে দর্শকদের তাকলাগানোর চেষ্টা দেখা যায়। এইসব চিত্র ঐতিহ্যেরই একটা অপভ্রংশ রীতি বোধহয়। এরই নবতম সংস্করণ লক্ষ্য করা যায় টেম্পো, লরি, রিক্সা ও অটো রিক্সার গাছে। পটচিত্র -- সরা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাগরীর বিগত শারদীয় (১৩৯৬) সংখ্যায় বিস্তারিত লিখেছি বলে একই কথার আর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

এবার আসি লোক ছড়ার কথায়। লোক শিল্পের সাথে লোকছড়ার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লোকছড়া যেমন কখনও শিশুকে ঘুম পাড়ানোর উদ্দেশ্যে কখনও অন্যান্য অতি সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হতো -- তাই ছড়া হতো শ্রুতিমধুর, সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ তাতে লাবণ্য আছে। জটিল কোন দর্শন নেই শিল্পের ব্যাকরণের অব্যবস্থারই যেন বাহাদুরী বেশী।

পুতুল বা খেলনার আকৃতিতে বা কর্মে দেখা যায় শিশুদের মনোরঞ্জনের সকল প্রচেষ্টা -- শিশুর ব্যবহার্য এবং মাত্র খুশীর জন্য; সুতরাং, শিশুর উপযোগী মাপ বা ওজন নক্সার সঙ্গেই নির্দিষ্ট থাকা চাই। সাপ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি কোন হিংস্র ভয়ার্ত পশুর খেলনা হলে চলবে না বেশীর বাগ শিশুরই। কারণ তাতে শিশু খেলার চাইতে ভয় পাবে বেশী। ভারতের গাড়োয়াল, রাজস্থান সহ হিমালয়তর রাজ্য তিববত, নেপাল, ভূটান, সিকিম ও চীনের শিল্পীদের হাতের ড্রাগন, সিংহ, বাঘ, সাপ ও শয়তানের চিত্রাবলী বেড়া টপকে অনেক সময় শিশুদের খেলনার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটায়! কিন্তু বাংলার শিল্পীদের হাতে পাখি, মাছ, গ, বাঁদর প্রভৃতির সঙ্গে যে বাঘ - সিংহের আবির্ভাব কখন - সখনো দেখা যায় তার মধ্যে কেমন একটা যেন কমনীয়তা -- হাস্যমুখের সন্ধান তথা অভয় ভাব মুদ্রিত থাকে। এমনি আর একটি তুলনা দেওযা যায় যেমন পারস্য অর্থাৎ ইরাণের শিল্পীদের হাতে পড়ে ড্রাগন বা শয়তান তার হিংস্রতা হারিয়ে মাধুর্যময় নক্সায় পরিণত হয়েছে।

শিশুদের এক জিনিস বেশীদিন ভাল লাগে না -- তাদের নতুন নতুন জিনিস চাই। তাই এর উপাদান যেমন হতে হবে সহজলভ্য; তেমনি তুলনামূলক ভাবে দামেও হতে হবে সস্তা। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি হলেই চলে। কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি -- বিশ্লেষণের জন্য হয়; শুধু কোনভাবে আছে বোঝা গেলেই হল। বাংলার এক কাটের জোড়া হাত পা 'টিপসি পুতুল' এদিক থেকে এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ যেমন শিশুকে ভুলিয়েছে তেমনি শিল্পকর্ম হিসেবে বিশ্ব মর্য্যাদার আসন লাভ করেছে। ব্যবহারিক দিক থেকে শিশুর হাতে এ পুতুল মাটির যায়গায় কাঠের তৈরী হলে যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তেমনি মজুরী ইত্যাদিকম হওয়ার ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত করেছে। খেলনা শিল্পে এই সব মনস্তত্ত্ব আর বেচাকেনার সাধারণ সূত্র ছাড়া আমরা জটিল কোনদর্শন কোন ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি এতে দেখছি না।

এইসব খেলনা হয় প্রধানত ঃ পোড়া মাটির অথবা কাঠের। এগুলির সঙ্গে যদিও প্রাচীন বাংলার ময়নামতি, পাহাড়পুর (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত) বা গৌড় - পাণ্ডুয়া কি দেগঙ্গায় প্রাপ্ত মূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। বরং মানভূম (পুলিয়া - পঞ্চকোট) ও নদীয়া মুর্শিদাবাদের লোক শিল্পের মিল চোখে পড়ে। মূলত ঃ এরা লোকজ রীতির অন্তর্ভূক্ত।

গ্রামীণ শিল্পের নিদর্শন আছে অজস্র। যেমন মঙ্গলঘট, আলপনা, লক্ষী সরা, সখের হাড়ি, শিকা, ঝুড়ি, মাটির পাত্র, পেতল - কাঁসা - তামার কাজ, সোনা - রূপার কাজ, জরি - শলমা - চুমকির কাজ, বেত, আঁশ, শন, তুলো, পাট ও বাঁশের ক াজ, শোলার কাজএবং আরো অনেক নাম জানা - অজানা শিল্প নিদর্শন, যা' গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে। সব ায়ের বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধের কলেবরআর বাড়াতে চাই না। আমাদের কৃষ্টির এই গুত্বপূর্ণ দিকটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেলেই স াধারণ মানুষের জীবন পদ্ধতি, অর্থ নৈতিক অবস্থা - এক কথায় তাদের সামগ্রিক জীবন প্রবাহের রূপ - প্রকৃতি বুঝতে প ারব এবং তাহলেই আমাদের লোক - শিল্পের ইতিহাস রচনা হবে সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর।